বাংলাদেশঃ দুর্নীতির অবিমিশ্র অভয়াশ্রম

তৌফিক রহমান চৌধুরী*
মাজহারুল হাসান মজুমদার**

প্রাক্-ভাষ

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল সরকার বিভিন্ন রকমের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসলেও এখন পর্যন্ত দেশটি প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। এই না পারার পেছনে বহুবিধ কারণ কার্যকর থাকলেও যে বিষয়টি বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধন করেছে সেটি হলো দুর্নীতি- বৈধ ক্ষমতার অবৈধ ব্যবহার। ১৯৭১ সনের পর থেকে অদ্যাবধি সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দুর্নীতির মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে; আর সম্প্রতি দুর্নীতি সার্বিকভাবে এতো অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এই হন্তারক ব্যাধির সর্বনাশা আস্ফালন থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা সাধারণ জনগণকে মুক্ত করার জন্য এর বিরূদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের সাহায্যে বাংলাদেশে দুর্নীতির ঐতিহাসিক ক্রম বির্বতন, স্বরূপ, সে গুলোর কারণ উন্মোচন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে দুর্নীতি নামক কালব্যাধির মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে কতিপয় বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী প্রস্তাব করার প্রয়াস চালানো হবে।

১. *ভূমিকা*

গত সরকারের শেষের দিকে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশকে দুর্নীতির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন প্রমাণ করে তাদের একটি গবেষনা প্রতিবেদন প্রকাশ করে অনেকটা হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার আদলে। প্রতিবেদনটি প্রকাশের ফলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার প্রচন্ড বেকায়দায় পড়ে যায় এবং শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো সেই সরকার প্রকাশিত প্রতিবেদনটিকে অন্তঃসার শূন্য,পূর্ব পরিকল্পিত, বানোয়াট ইত্যাদি বহুবিধ বিশেষণে বিশেষণে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে তৎকালীন বিরোধীদল প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর সদলবলে সমস্বরে এমন ছিঃ ছিঃ করা শুরু করলো যেন 'দুর্নীতি' নামক শব্দটি এর আগে কেউ কখনোই শোনেনি। দুর্নীতির মতো না-জায়েজ হারাম কাজ এই বঙ্গদেশে কস্মিনকালেও কেউ করেনি। তাদের বিস্ময় সূচক লম্ফঝম্ফে মনে হয়েছে যে, তৎকালীন সরকারের শাসনামলেই কেবল 'দুর্নীতি' নামক পরমাশ্চর্যের বিষয়টি আপনা আপনি নাজিল হয়েছে। প্রকাশিত রিপোর্টটিকে তারা

*চেয়ারম্যান, মেট্রোপলিটান ইউনির্ভাসিটি, সিলেট, পরিচালক, ম্যার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ
**প্রভাষক, ব্যবসা প্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলো এবং পরবর্তী নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বিদায়ী সরকারকে ঘায়েল করার কাজে সুকৌশলে তারা সেটি ব্যবহার করলো। (ঘটনা ক্রমে তখনকার সেই বিরোধীদলই বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী সাংসদ নিয়ে বাংলাদেশের সরকার পরিচালনা করছে; এবং বর্তমান সরকার তাদের শাসনামলের প্রথম অর্ধে দেশের দুর্নীতি পরিস্থিতির যে শনৈ: শনৈ: উন্নতি করেছে তাও কারো অজানা নয়)।

অথচ সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, দুর্নীতি - অবৈধভাবে বৈধ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ - হঠাৎ করে শুরু হওয়ার মতো কোন বিষয় নয়; বরং দীর্ঘ দিন ধরে লালন ও চর্চা করার ফলেই কেবল দুর্নীতি কোন সমাজে তার স্থান পোক্ত করতে পারে। তাই একথা বলা যায় যে, কোন একটি দেশে একটি সরকার তার একটি মাত্র শাসনামলে দুর্নীতিকে সর্বজনীন রূপ দিতে পারেনা। অতএব, বাংলাদেশেও দুর্নীতি আগে থেকেই চালু ছিলো, একের পর এক সরকার তথা ক্ষমতাসীন দল পরির্বতন এবং দীর্ঘদিন ধরে সামরিক শাসনের ফলে তা কেবল তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে মাত্র।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় হয়েছে; হিংসা-হানাহানি, অনাচার-অত্যাচার তীব্র ভাবে বেড়েছে; জনগণের মৌলিক মানবাধিকার হয়েছে নগ্ন ভাবে লংঘিত; ন্যায় বিচার আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি; রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সযত্নে লালন করা হয়েছে ঘাতক সন্ত্রাস; ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য ধূর্ত সেনা প্রশাসক আর আদর্শহীন নীতিভ্রষ্ট অসৎ রাজনীতিকেরা সুপরিকল্পিত ভাবে দেশের কোমলমতি ছাত্রদের হাত থেকে পবিত্র কলম কেড়ে নিয়ে তাদের নিস্পাপ হাতে তুলে দিয়েছে নিষিদ্ধ মারণাস্ত্র; ফলে, আমাদের শিক্ষাঙ্গন গুলো থেকে উধাও হয়ে গেছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ; সাধারণ নাগরিক হারিয়েছে তার স্বাভাবিক মৃত্যুর সামান্যতম গ্যারান্টি; আর রাজনীতিতে ঘটেছে ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন। স্বাধীনতা অর্জন পরবর্তী তিরিশ বছরে জাতি হিসেবে আমরা আমাদের মর্যাদার চরম অবমূল্যায়ন করেছি। আমাদের সামাজিক অনুশাসনের সুগভীর গ্রন্থিগুলো একটি একটি করে বিনষ্ট করেছি আমরাই, ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আর বিবেক হারিয়ে আমরা ক্রমশ মারাত্নক আত্নঘাতী হয়ে পড়েছি। অনাদর আর অবেহেলায় মুক্তিযুদ্ধের ইস্পাত কঠিন চেতনা থেকে আমরা ক্রমশ যোজন যোজন দূরে সরে গেছি। আর ইত্যাদি সবকিছুকে ছাপিয়ে, এ সবকিছুর অনিবার্য ফল হিসেবে এদেশে দুর্নীতি' নামক কালব্যাধি আজ সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতির নির্লজ্জ উপস্থিতি বিরাজ করছে। দুর্নীতির প্রবল স্রোতে সমূলে ভেসে গেছে পেশাগত ন্যায়নীতি আর মূল্যবোধ। পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনের প্রতিযোগিতা ভুলে গিয়ে সর্বস্তরের পেশাজীবিরাই আজ দুর্নীতিবাজ হবার মুষিক-দৌড়ে লিপ্ত। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও সততার বদলে দুর্নীতি আজ সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। উচ্চ পদস্থ সরকারি আমলা থেকে গ্রামের চৌকিদার, সরকারের মন্ত্রী থেকে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, সবাই সমন্বিত ভাবে সুনিপুণ মেকাপম্যানের মতো দুর্নীতিকে আজ অসাধারণ এক *কর্পোরেট কালচার*' এর রূপ দিয়েছে। সার্বিক ভাবে, দুর্নীতি আজ এতোই ব্যাপক, দুর্নীতির শেকড় সমাজের এতোই গভীরে প্রোথিত যে, 'দুর্নীতি' শব্দটি অনেকের কাছেই এখন আর কোন নেতিবাচক অর্থের দ্যোতনা ঘটায়না। দুর্নীতিবাজ হওয়াটাই যেন গৌরবের, অহংকারের উপলক্ষ হয়ে উঠেছে। এদেশের সমাজে এখন সৎ মানুষকে করতে হয় আতঙ্কিত জীবন যাপন, আর দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা দেয় নির্লজ্জ উল্লম্ফন। বাংলাদেশে দুভার্গ্যজনক ভাবে আজ অসতের কাছে সৎ, মন্দের কাছে ভালো,

নীতিভ্রষ্টের কাছে নীতিবান, অসুন্দরের কাছে চিরায়ত সুন্দর, এমনকি পাপের কাছে পুণ্য প্রবল ভাবে পরাজিত। আর তারই অনিবার্য আবশ্যিকতায় এদেশে এখন একের প্রতি অপরের-পিতার প্রতি পুত্রের, অগ্রজের প্রতি অনুজের, শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর পারস্পরিক স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ জঘন্য রকমের লোপ পেয়েছে (*কোন কোন ক্ষেত্রে বরং শিক্ষককেই দেখা যায় প্রাক্তন ছাত্রকে কূর্ণিশ করতে*)।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বোদ্ধামহলের মতে, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মানব সভ্যতা যতোই অগ্রসর হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস- আর তারই ধারাবাহিকতায় দুর্নীতিও ততোই ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেপ্টেম্বর ১১ ট্যাজেডি সাময়িক ভাবে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা বাড়ালেও এখন আমরা নিত্যই নতুন নতুন দুর্নীতির সংবাদ পাচ্ছি। পৃথিবীর সব বিখ্যাত রাজনীতিক, বড় বড় খেলোয়াড়ের নাম জড়িয়ে চমকপ্রদ দুর্নীতির কথা আমরা অহরহই শুনে আসছি। সেই 'ওয়াটার গেট' থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক 'এনরন ও ওয়ার্ল্ডকম' কেলেংকারী কিংবা সেই 'কম্বল-কাহিনী' থেকে শুরু করে অধুনা 'ফেরী বা গম কেলেংকারী' ইত্যাদি অনেক বড় বড় দুর্নীতির ঘটনা অনেক বার অনেক দেশেই ঘটেছে, ঘটছে, এবং অদূরভবিষ্যতেও ঘটবে। বিশ্ব সভ্যতার এই মাহেন্দ্রক্ষণে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোন প্রকার দুর্নীতি না করে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অনেকাংশেই অসম্ভব। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এখন একথা বলা যেতে পারে যে, দুর্নীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রায় সর্বজনীন তথা সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাংলাদেশই এখন দুর্নীতিতে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। হাস্যকর হলেও পরীক্ষিত সত্য হলো এই যে, আমরা, অর্থাৎ বাংলাদেশীরা দুর্নীতিকে মোটামুটি একটি নিপুণ শিল্পের পর্যায়ে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি।

আলোচ্য প্রবন্ধে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর বিশ্লেষণী পর্যালোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রবন্ধটিতে 'দুর্নীতি' ধারণাটির তাত্ত্বিক দিকগুলো মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্নীতির স্বরূপ উন্মোচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক ভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির ধরন-ধারণ পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। সামগ্রিক জনগণের ওপর যারা কোন ভাবেই এসব দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নন দুর্নীতি ও তার প্রভাব কতোটা ব্যয়বহুল (costly) তা নির্ণয় শেষে প্রবন্ধটিতে দেখানো হয়েছে যে, অন্তত রাষ্ট্রীয় অপচয় রোধ করতে হলেও দুর্নীতির দ্রুত অবসান বাঞ্চনীয় নয় বরং অনিবার্য। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করত: জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা বলবৎ করা গেলে দুর্নীতির লাগাম যে ভালো ভাবেই আয়ত্তে রাখা যায়, আলোচ্য প্রবন্ধ সেই সাক্ষ্যই বহন করে। আর এক্ষেত্রে তথ্যের তুলনামূলক অবাধ প্রবাহ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণের মনে সম্প্রতি যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে পারাটাই মূল চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ইদানিং ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হতে শুরু করেছে ; আর এই মূল্যবান জনমতকে ভিত্তি করে সরকারকেই সামনে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইটা শুরু করতে হবে। আবার লড়াইটা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও সরকারকেই নিতে হবে। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, কোন রাজনৈতিক সরকার যদি সত্যিই দুর্নীতি বন্ধের মতো জটিল কাজটি করে ফেলতে পারে, তবে তার সুফলও সর্বপ্রথম সেই সরকারণ ভোগ করবে।

২. *দুর্নীতি - তত্ত্বগত মূল্যায়ন*

যে কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে হলে প্রথমেই বিষয়টির একটি প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্চনীয়।

২.১ *দুর্নীতি কি?*

দুর্নীতির ওপর পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা যতো বাড়ছে 'দুর্নীতি' বিষয়টির সংজ্ঞাগত জটিলতাও ততোই বাড়ছে। দুর্নীতি গবেষক ও লেখকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের রচনার সিংহভাগ অংশই দুর্নীতির সংজ্ঞায়নে ব্যয় করে আসছেন। তথাপি, এখন পর্যন্ত দুর্নীতির এমন কোন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি যা স্থান, কাল, প্রেক্ষিত নির্বিশেষে প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেবল OXFORD LEARNERS অভিধানেই দুর্নীতির নয়টি সংজ্ঞা রয়েছে। দুর্নীতির এ সংজ্ঞা সংকটের একটা অন্যতম কারণ হলো সমাজ বা দেশ ভেদে দুর্নীতির স্বরূপ ও প্রয়োগিক ভিন্নতা।

যাহোক, দুর্নীতি বিষয়টির সাথে তিনটি বিষয় যথা: বিনিময় (exchange), কাজ (activity) এবং আচরণ (behavior) ওতপ্রোত ভাবে জড়িত (জান্নাতুল, ২০০১)[১]। মূলত দুর্নীতি স্বতন্ত্র, সমাজবিচ্যুত, নৈর্ব্যক্তিক কোন বিষয় নয়, বরং তা একটি বিশেষ মানব আচরণ ও অন্যান্য কিছু জটিল সামাজিক চলকের সমন্বয়, যার কোনটি পুরোপুরি বিমূর্ত বা আংশিক দুর্বোধ্য। কোন কোন গবেষক দেখিয়েছেন, 'দুর্নীতি এমন ব্যবহার যা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কোন বিশেষ দায়িত্বে মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তিকে যথাযথ কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত রাখে' (যোসেফ নাঈ, ২০০১)[২]। তবে এখন পর্যন্ত দুর্নীতির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, 'ব্যক্তিগত লাভালাভ অথবা গোষ্ঠির স্বার্থের জন্যে (যে গোষ্ঠির কাছে ব্যক্তিটি কর্তব্য হিসেবে কিছু দিতে বাধ্য থাকে) সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারই হচ্ছে দুর্নীতি।' যাহোক, দুর্নীতির সংজ্ঞা সংক্রান্ত উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতা সমূহ বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে দুর্নীতির সামগ্রিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে 'দুর্নীতি' কে কিছুটা ব্যাপক ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: 'ব্যক্তি বা সমষ্টিগত কোন লাভের আশায় (যা সাধারণ ভাবে অর্জনযোগ্য নয়) প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ করাই হলো দুর্নীতি।'

২.২ *আমরা কেন দুর্নীতিবাজ হলাম?*

দুর্নীতি, বিশেষ করে দুর্নীতির বাংলাদেশী স্টাইল নিয়ে আলোচনার সর্বাগ্রেই যে প্রশ্নটি আসে তা হলো: "আমরা, মানে বাংলাদেশীরা, কেন ও কিভাবে এতোটা দুর্নীতিবাজ হলোম"? অর্থাৎ বাংলাদেশে দুর্নীতি এমন সর্বগ্রাসি রূপ নেয়ার পেছনে প্রভাবক হিসেবে যে বিষয়গুলো সক্রিয় ছিলো সে গুলোর বিচার-বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। আর দুর্নীতির প্রধান কারণ এবং সেই কারণের কার্যকরণ গুলো চিহ্নিত করা গেলে, সেগুলো দূরীকরণের মাধ্যমে একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়টি সহজতর হবে বৈকি। এবং দুর্নীতির সার্বিক ধরনগুলো সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা গেলে বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির মূলে কি কি কারণ নিহিত রয়েছে তা অনুসন্ধান করার কাজটি অনেকটাই সহজতর হবে। আর বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির যথাযথ কারণ গুলো চিহ্নিত করতে পারার অর্থ হচ্ছে, সেই কারণ গুলো সাফল্যের সাথে দূরীকরণের পথে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া। এহেন প্রেক্ষাপটে, প্রবন্ধটির এ পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রচলিত দুর্নীতি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা অনিবার্য ভাবেই বাঞ্চনীয়।

২.৩ *বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকার ভেদ*

সাধারনভাবে দুর্নীতি বলতে আমরা কেবল নানান রকম অবৈধ আর্থিক লেনদেন (যথা: ঘুষ ইত্যাদি) কে বুঝিয়ে থাকলেও ইতিমধ্যে দুর্নীতি নামক বিষবৃক্ষের শেকড় এতো গভীরে বিস্তৃত হয়েছে যে, সমাজ কাঠামোর এমন কোন স্তর, অর্থনীতির এমন কোন ক্ষেত্র, রাষ্ট্রের এমন কোন অঙ্গ, কিংবা প্রশাসনের এমন কোন স্তর পাওয়া যাবেনা যেখানে কোননা কোন ভাবেই কোন রকম দুর্নীতির চর্চা হচ্ছে না। মোদ্দাকথা হলো, দুর্নীতির ভয়ঙ্কর তথা সর্বভূক দৈত্য তার হিংস্র থাবা দিয়ে এই দেশটার আপাদমস্তক এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে অচিরেই বিশ্বের কোন দেশ আমাদেরকে দুর্নীতির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারবেনা ইন্‌শাল্লাহ। কেননা, দুর্নীতির মুষিক দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকারের পর আমরা ন্যুনতম আত্মতুষ্ট বা অহংকারী না হয়ে বরং কুশলী পেশাদার খেলোয়াড়ের মতো বিষয়টির ওপর আরো বেশী দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সযত্ন পরিশ্রম করে যাচ্ছি, যাতে অন্য কোন দেশ বা জাতি আমাদের শ্রেষ্ঠত্বকে এতোটুকু হুমকী দিতে না পারে।

যাহোক, আমাদের দেশে দুর্নীতি নামক অপকর্মটি কতো ভাবে প্রচলিত রয়েছে, তার স্বরূপ উন্মোচন করা যাক। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে,বাংলাদেশে দুর্নীতির ওপর বিস্তর গবেষণা হলেও সিংহভাগ গবেষকই দুর্নীতির সর্বনাশা হিমবাহের ১১ ভাগের ১ ভাগের ওপরেই তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ফলত: সে সব গবেষণা থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়; এবং এই দলের গবেষকদেরকে 'School of Thought-1' ও দ্বিতীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী গবেষকদেরকে 'School of Thought-2' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রচনার পরবর্তী অংশে বাংলাদেশে দুর্নীতির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে লুকায়িত সুবিশাল হিমবাহটির অদেখা সেই ১০ ভাগ উন্মোচনের প্রয়াস চালানো হবে।

School of Thought-1

এক শ্রেণীর গবেষক দুর্নীতিকে কতিপয় বৈশিষ্টের ভিত্তিতে বিভাজন করেছেন। যথা, স্তর-ভেদে দুর্নীতি, শ্রেণী ভিত্তিক দুর্নীতি, কাঠামোগত দুর্নীতি, সংখ্যাগত ও গুণগত দুর্নীতি প্রভৃতি। এই পাঁচ ধরনের দুর্নীতিকে আরো ক্ষুদ্রতর কতোগুলো শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে।

ধরন ১ - *মাত্রা ভেদে দুর্নীতি*

(ক) মামুলি দুর্নীতি (Petty Corruption): এ ধরনের দুর্নীতি সাধারনত নিম্নশ্রেণীর অধ:স্তন কর্মকতা/কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়।

(খ) মাঝারি দুর্নীতি (Middling Corruption): সংগঠন পর্যায়ে মূলত শীর্ষ স্থানীয় আমলারা এ ধরনের দুর্নীতির মূল হোতা।

(গ) বৃহৎ দুর্নীতি (Grand Corruption): এ প্রকারের দুর্নীতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়।

ধরন ২ - শ্রেণী ভিত্তিক দুর্নীতি

(ক) ব্যক্তিগত দুর্নীতি (Personal Corruption): এ ধরনের দুর্নীতি বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন ধারাবাহিকতা ব্যতিরেকে ব্যক্তি আমলা বা রাজনীতিবিদের দ্বারা সম্পাদিত হয় ।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি (Institutional Crruption): কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান, বিভাগ, সেক্টরে প্রচলিত দুর্নীতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত ।

(গ) নিয়মতান্ত্রিক দুর্নীতি (Systematic Corruption): পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে সকল প্রকার লেনদেনের স্বীকৃত মাধ্যম হিসেবে যখন দুর্নীতি বৈধতা লাভ করে তখন তাকে নিয়মতান্ত্রিক বা সর্বজনীন দুর্নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ।

ধরন ৩ - কাঠামোগত দুর্নীতি

(ক) আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি (Bureaucratic Corruption): সাধারণ ভাবে দুর্নীতি বলতে যা বুঝায় তাকেই আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বলে । এ ক্ষেত্রে সরকারী আমলারা ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি কারণে তাদের স্বীয় দায়িত্বে অবহেলা বা উদাসিনতা প্রর্দশন করে ।

(খ) রাজনৈতিক দুর্নীতি (Political Corruption): এটি প্রকৃত পক্ষে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির বিশেষ বর্ধিত রূপ ।

ধরন ৪ - পরিমাণগত দুর্নীতি

(ক) বড়ো অংকের দুর্নীতি (Wholesale Corruption): এ ধরনের দুর্নীতি হয় মোটা দাগে পাইকারি হারে যা সাধারণের কাছে 'পুকুর চুরি' হিসেবে পরিচিত ।

(খ) খুচরা দুর্নীতি (Retail Corruption): এ শ্রেণীতে ছোট খাটো পরিসরে অধ:স্তন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অল্প সল্প অর্থ ঘুষ হিসেবে আদান প্রদান হয় ।

উদাহরণ: রেলের টিকেট পেতে, লাইসেন্স বিহীন গাড়ি চালাতে, বিনা ভাড়ায় সরকারী পরিবহনে ভ্রমণ করতে, কিংবা অনির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্ক করলে ট্রাফিক সার্জেন্টকে যে পরিমাণ টাকা দিয়ে খুশী করা যায় সে গুলোকেই খুচরা দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ।

ধরন ৫ - গুণগত দুর্নীতি

(ক) কেন্দ্রীভূত দুর্নীতি (Centralized Corruption): সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যে দুর্নীতি হয় সে গুলোই কেন্দ্রীভূত দুর্নীতি । উদাহরণ: ফেরী মেরামত, যুদ্ধ জাহাজ, কিংবা যুদ্ধ বিমানের মতো জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সব সাত-পাঁচ হয়ে থাকে, সে গুলো এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ।

(খ) বিকেন্দ্রীভূত দুর্নীতি (Decentralized Corruption): রাষ্টের সর্বোচ্চ, কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মন্ত্রী, সচিবদের গন্ডি ছাড়িয়ে দুর্নীতির ঢেউ যখন ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বা পৌরসভার চেয়ারম্যান/মেম্বারদের নাগালে চলে যায়, তখন দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে বলা যায় ।

School of Thought-2

অন্য আরেক শ্রেণীর গবেষক 'দুর্নীতি'র উপরোল্লিখিত শ্রেণী বিন্যাসকে ব্যাষ্টিক তথা সংকীর্ণ আখ্যা দিয়ে বিষয়টিকে সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতির ভিন্ন রকম একটি ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তবে দু'পক্ষের বিবেচ্য বিষয় যেহেতু এক ও অভিন্ন অর্থাৎ দুর্নীতি, তাই দুটো শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকা অস্বাভাবিক কোন বিষয় নয়। দ্বিতীয় পক্ষের গবেষকগণ

দুর্নীতির আধুনিক বিন্যাস

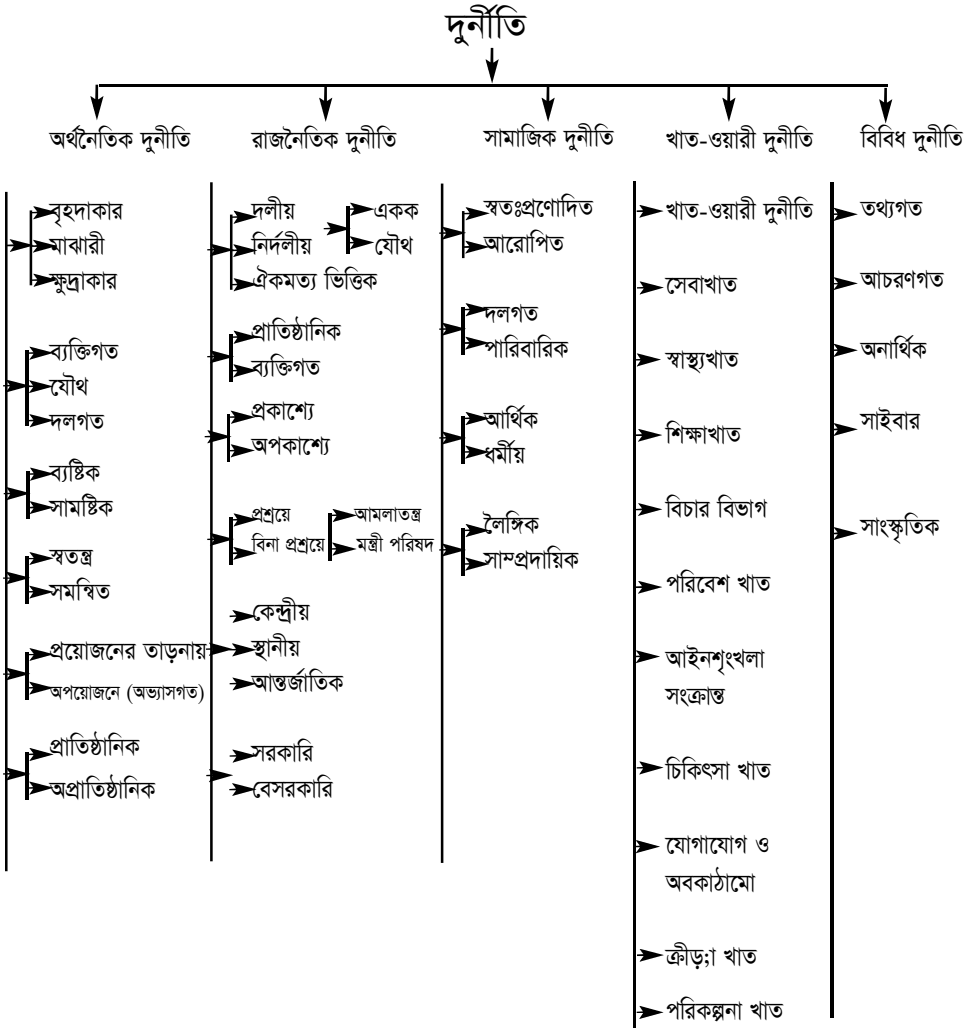

© মাজহারুল হাসান মজুমদার, ২০০২।

দুর্নীতিকে সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, তাকে গবেষকগণ দুর্নীতির আধুনিক স্বরূপ রূপে আখ্যায়িত করেছেন ।

২.৪ *বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণ*

বাংলাদেশে দুর্নীতির সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাবের মূলে অসংখ্য কারণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে । বর্তমান প্রবন্ধটির আকৃতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান অসম্ভব বিধায় অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

- অদূরদর্শী রাজনীতিক - ভ্রান্ত আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত
- রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ঐকমত্যের অভাব
- রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন
- দুর্বল আমলাতন্ত্র
- নিম্ন মজুরী (বেতন) কাঠামো
- জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অনুপস্থিতি
- সমাজ, বিশেষত সুশীল সমাজের উদাসীনতা
- সুশাসন ও ন্যায় বিচার এর অভাব
- ব্যক্তিগত,পারিবারিক,সামাজিক মূল্যবোধের চরমতম অবক্ষয়
- প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক সংখ্যা
- সংবাদ মাধ্যমের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ
- তথ্যের সীমিত(সংরক্ষিত) প্রবাহ ।

৩. *ঐতিহাসিক পটভূমি*

কখনো বাংলা, কখনো ভারতবর্ষ, কখনো পূর্ব পাকিস্তান, আর সবশেষে বাংলাদেশ নামে পরিচিত এই ভূ-খন্ডের মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই অসৎ, দুর্নীতি পরায়ণ ছিলো এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে নেই । এই আঞ্চলের সার্বিক ইাতহাস কে ঐতিহাসিকগণ চারটি সমকালে বিভক্ত করেছেন, যথা প্রথম যুগ (খৃষ্টের জন্মের পূর্ব থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত), দ্বিতীয় যুগ (১২০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) যা মুসলিম যুগ হিসেবে খ্যাত, তৃতীয় যুগ (ইংরেজ শাসনামল ১৭৫৭-১৯৪৭), এবং চতুর্থ যুগ (১৯৪৭ পরবর্তী) । চারটি যুগের মধ্যে কেবল মুসলিম যুগ অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগে এ অঞ্চলে দুর্নীতির সামান্য প্রমাণ পাওয়া যায় । বাংলার সম্পদ বাংলার বাইরে রাজার প্রাপ্য হিসেবে চলে যাওয়ার প্রমাণ এ যুগেই পাওয়া যায়; এর পূর্বের তথ্য অস্পষ্ট । এই যুগে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্র এ অঞ্চলে গড়ে উঠতে থাকে এবং এক শ্রেনীর ধনী বনিক টাকা বদলানোর ব্যবসার সাথে সাথে মহাজনী কারবার শুরু করে; এদের সরোফ্ বলা হতো (Chucherov, ১৯৭১) ।

মুসলিম যুগে বাংলাদেশের (তৎকালিন) অর্থনৈতিক জীবনে সরকারি হস্তক্ষেপ ক্রমশ: বাড়ছিলো । টাকার প্রয়োজনে এদেশের শাসনকর্তাগণ দিল্লীর সুলতানদের এক ধরনের ব্যবসা শুরু করে দেয় । এই ব্যবসার নাম ছিল 'সৌদায়ে খাস' অর্থাৎ, আমদানী ও রপ্তানির ব্যাপারে রাজক্ষমতা ব্যবহার করে সরকারি কর্মচারীগণ দেশের অভ্যন্তরে মাল কেনা-বেচা করতো এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ব্যবসা কেড়ে নিয়ে একচেটিয়া মুনাফা করতো । বলা বাহুল্য, এই দুর্নীতি শাসন ব্যবস্থার ক্ষতি করে ও

অর্থনীতির অবনতি হতে থাকে (ফারুক,১৯৮১)[৪] ।

তৃতীয় অর্থাৎ ইংরেজ যুগে নানাভাবে বৃটিশ সরকার এদেশের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কার্যবলীর সাথে নিজেকে যুক্ত করতে থাকে । ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাধারণত: বাংলাদেশে পলাশী যুদ্ধের সময় হতে ইংরেজ সাহেবরা যে দুর্নীতি, ঘুষ ও চক্রান্তের প্রবাহ সৃষ্টি করে তা ইংল্যান্ড ও এদেশের উভয় অঞ্চলের জন মানুষের চিন্তারও বাইরে ছিলো । সুতরাং পরবর্তী কালে আমাদের দেশের জনশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের পথে আর একটি বাধা হিসেবে দেখা দেয় সমাজের প্রচলিত দুর্নীতি । আরেকটি গবেষণায় দেখা যায় যে, মূলত ১৭৫৭ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই এদেশে দুর্নীতি শুরু হয় । এবং এটিই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনকাল (জান্নাতুল, ২০০১) ।

চতুর্থ অর্থাৎ ১৯৪৭ পরর্বতী সময়ে দুর্নীতি এই ভূ-খন্ডে অর্থাৎ তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে । এ যুগ সম্পর্কে সবচেয়ে নিরেট আলোচনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক : "সরকার যদিও ঘোষণা করেছেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিতে হইবে; কিন্ত পর পর তিনটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-১৯৭০) বাস্তবায়নের পরও পাকিস্তানে অঞ্চলিক বৈষম্য বাড়িয়াই যায় । সরকারি তথ্যে প্রকাশ, ১৯৫৯-১৯৬০ সনে যদি আঞ্চলিক বৈষম্য থাকে ১০০, তবে ১৯৬৯-১৯৭০ সনে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯১ হয় (পাকিস্তান চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জুলাই ১৯৭০) । ... ... কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তৎকালীন নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সুযোগ লইয়া নামে - বেনামে প্রচুর সম্পদ, জমি, বাড়ি, শিল্প কারখানার পারমিট ও লাইসেন্সের মালিক হইয়া বসে । ফলে দুর্নীতির প্রসার যেমন হইলো, তেমনই পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের দুর্গতি ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিলো৬ বাঙালী রাজনীতিক, আমলা ও শহুরে ধনী শ্রেণী অবশ্য বিদেশী সাহায্যের কল্যাণে ভালোই ছিল ।" অর্থাৎ ১৯৪৭ পরবর্তী স্বাধীন পাকিস্তানের দুই অংশের (পূর্ব ও পশ্চিম) মধ্যে বৈষম বাড়তে লাগলো । আর এই বৈষম্যের প্রভাবক হলো ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি । ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীকার থেকে পুন:স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আরো একটি অধ্যায় - নতুন একটি যুগ সংযোজিত হলো অনিবার্য ভাবে । ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হলো পৃথিবীর মানচিত্রে । আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৭১ পরবর্তী সময়টাকে পঞ্চম যুগ (১৯৭১-২০০২) হিসেবে নির্দিষ্ট করা হলো ।

পঞ্চম যুগে অর্থাৎ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম লগ্নে সোপার্জিত স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি আমরা আরো পেয়েছি দুর্নীতির অনিবার্য উত্তরাধিকার । মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সরকার সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে অনেকটা অবধারিত ভাবেই সকল গুরুত্বপূর্ণ খাতের রাষ্ট্রীয়করন করলো । পাশাপাশি কিন্তু বেসরকারি খাতে সঞ্চয়, ব্যক্তিগত সম্পদ আর কালো টাকা বিদেশে পাচার ও চলতে থাকলো । ফলশ্রুতিতে, তিনটি বিষয়ের প্রকট অভাব দেখা দিলো -পশ্চিম পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া গুটিকতক শিল্প কারখানা গুলোর জন্য দক্ষ পরিচালক, দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক সরকারি আমলা, আর সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী প্রকৃত রাজনীতিক, যারা সরকারের গৃহীত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য অপরিহার্য অবদান রাখবেন । ফলে সরকারের সামগ্রিক পরিচালন-ব্যয় গেলো বেড়ে; সরকার হলো ঋণগ্রস্ত, শুরু হলো রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান গাথা । ১৯৭৫ সনের বিয়োগাত্মক পট পরির্বতনের পর দেশের শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করা সামরিক সরকার রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদনশীলতার উন্নতি, অপচয় রোধ ও দুর্নীতি দমনের আপ্রাণ চেষ্টা (নাকি অভিনয়!) করেও ব্যর্থ হয় । এই অবস্থা পূর্ন সমাজতন্ত্র অথবা বাজার অর্থনীতি

দুটোর যে কোনটির চেয়েই খারাপ। কারণ সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা দুর্বল হতে পারে, কিন্তু ঐ অবস্থায় দুর্নীতি করে সম্পদ ব্যক্তিগত অধিকারে রাখা যায়না; আবার বাজার অর্থনীতিতে কিছুটা দুর্নীতি থাকলেও পরিচালনগত দক্ষতা পূর্নমাত্রায় বজায় থাকে। তৎকালীন বাংলাদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলো থাকায় এদেশে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয় ব্যবস্থার ত্রুটি গুলোর যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলো। ফলশ্রুতিতে, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি দুটোই বাড়লো। ফলে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে সোনার বাটি বানানোর দামামা তুলে আবার ক্ষমতার পরিবর্তন হলো ১৯৮১ সনে। ১৯৮২ সনে পুনরায় মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই লোকসানী প্রতিষ্ঠান সমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ করা শুরু হলো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর তিন দশকেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এই নাতিদীর্ঘ সময়ের সিংহভাগই এদেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতির কান্ডারী ছিলো সামরিক বাহিনী। সেই বিগত ৩০ বছরে সরকার বস্তুত উৎপাদন বাড়াতে না পারলেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং সরকারী চাকুরের সংখ্যা বিপুলভাবেই বাড়াতে পেরেছিলো। এই সকল লোক নিয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই কর্ম কমিশনের মাধ্যমে বা কোন নিরপেক্ষ বোর্ড দ্বারা সম্পন্ন হয়নি। একটি হিসাবে জানা যায়, ১৯৫০ সনে যেখানে সরকারের গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৫০০, সে ক্ষেত্রে ১৯৮০ সনে ঐ সংখ্যা প্রায় ২৭,০০০ হয়েছে, অর্থাৎ যদিও প্রকৃত মাথাপিছু আয় প্রায় পূর্বের ন্যায়ই ছিলো, এইটুকু উৎপাদন বজায় রাখতে সরকারের কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়েছে প্রায় ৫০ গুণ। যদি দক্ষ ও যোগ্য কর্মচারী না থাকে এবং তাদের কাজের হিসেব নেয়া না হয়, তবে সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও দেশের প্রশাসন ও আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল হবে না। বাংলাদেশে দেখা যায় সরকার অধিক কাজ নিজের হাতে নিয়েছে, অধিক ব্যয় করছে, কিন্তু বিশ্ব ব্যাংকের হিসেব অনুসারে আমাদের গড় বাৎসরিক প্রকৃত মাথাপিছু আয় ষাটের ও সত্তরের দশকে ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৫০ বছরে উন্নয়নের উপকাঠামো গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, যা সরকারের দায়িত্ব ছিলো। অপরপক্ষে, শিল্প কারখানা ইত্যাদির অহেতুক মালিকানা গ্রহণ করে সরকার লোকসান দিয়েছে, যা প্রয়োজন ছিলো না। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে।

৪. দুর্নীতি রোধকরা জরুরী কেন?

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, বিশ্বব্যাপী দীর্ঘ স্থায়ী মন্দা এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতার এই যুগে দুর্নীতি গ্রস্ত কোন দেশের পক্ষে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। আর বাংলাদেশের মতো পরার্থপর কোন অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা অনেক বেশী কঠিন। বাংলাদেশের জনগণ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের সর্বগ্রাসী তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়ে সভা-সেমিনার, পত্র-পত্রিকায় আলোচনা ও মিছিলে শ্লোগান দিলেও দিনের পর দিন এই দুটি সমস্যা আশঙ্কজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই মনে করে থাকেন অযোগ্য রাজনীতিবিদ ও সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে বিকশিত অসুস্থ রাজনীতিই দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূল কারণ।

স্বাধীনতার সময় উন্নয়নের সমপর্যায়ে থাকা দেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, গত তিন দশকেরও বেশী সময়ে আমাদের আপেক্ষিক কোন অগ্রগতি হয়নি। কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিদেশী বিনিয়োগ, দেশের আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এর সাথে জড়িত। দুর্নীতি না দূর

হলে দারিদ্র্য বিমোচন হবে না, উন্নয়নও হবে না এবং সৎ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যাবে না।

যাহোক, বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা কেন অনিবার্য তা সংক্ষেপে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. দুর্নীতি বিশ্বায়নের সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা হ্রাস করে।
২. দুর্নীতি বিশ্বায়নের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।
৩. দুর্নীতি দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তির নৈতিক মনোবল হ্রাস করে।
৪. দুর্নীতি সামাজিক নৈরাজ্য বৃদ্ধি করে ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।
৫. সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নে দুর্নীতি বাধা সৃষ্টি করে।
৬. দুর্নীতি প্রশাসনিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে।
৭. দুর্নীতি সামাজিক অনুশাসন ও মূল্যবোধ বিনষ্ট করে।
৮. দুর্নীতি সুষ্ঠ ও সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করে।
৯. দুর্নীতি সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে ।
১০. দুর্নীতি আর্থসামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।
১১. দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যয় বাড়িয়ে দেয়।
১২. ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দুর্নীতি সার্বিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে।

৪.১ মাস্তানতন্ত্র দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে

মাস্তানতন্ত্র দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই মাস্তানতন্ত্রের কারণে দেশে নারী নির্যাতন উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলছে। গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে সমহারে বাড়ছে এ নারী নির্যাতন। আইনশৃংঙ্খলা পরিস্থিতি নিরাপত্তাহীনতা এবং সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে, যা সার্বিক ভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সরকারের উন্নয়ন কৌশলপত্রে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আইনশৃংঙ্খলাকে প্রধান উদ্বেগের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবনতিশীল আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিচ্ছে; এর ফলে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে, নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, নৈতিকতা ভেঙ্গে পড়ছে এবং রাজনীতিতে অসহিষ্ণু সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। সারা দেশেই এখন স্থানীয় মাস্তানতন্ত্রের বিস্তার ঘটেছে।

যারা মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে, তাদের অধিকাংশ স্কুল কিংবা কলেজ ছাত্র, যারা নানা কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। কর্মহীনতাই তাদের সন্ত্রাসের পথে নিয়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে এই মাস্তানদের ব্যবহার এখন দেশবাসীর প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার উন্নয়র কৌশলপত্রে বিদ্যমান পুলিশী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংস্কারের মাধ্যমে আইনশৃংঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে জনপ্রশাসনের কাছে জবাবাদিহিতার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্থানীয় সরকার। বাংলাদেশে হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এই ধরনের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্ভব নয়। রাজনৈতিক পছন্দ অপছন্দ যাই থাকুক না কেন, দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অতি জরুরী বিষয়।

কেবলমাত্র স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। ইউনিয়ন এবং থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কার্যকর করা ছাড়া স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সেবার মান বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে না। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দরিদ্রদের জন্য খাদ্য বা নগদ অর্থ সহায়তা সংক্রান্ত কর্মসূচীগুলো স্থানীয় সরকার সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে। এভাবে স্থানীয় সরকার স্কুলের ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, হেলথ সেন্টার, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রভৃতির ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হতে পারে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার বেসরকারি এবং সরকারি কর্মসূচি গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে। এতে অপচয় কমবে এবং একই কাজের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পাবে (দৈনিক জনকণ্ঠ ২২জুন ২০০২)।

৪.২ *বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দুর্নীতির মূল্য*

দীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসানের মাধ্যমে ১৯৯১ সনে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঘুষ, দুর্নীতি ও অবৈধ লেনদেন ইত্যাদি এখন বাংলাদেশে নিত্যদিনের স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং এসব অলিখিত নিয়ম কানুন পাশ কাটিয়ে কোন কাজ সম্পন্ন করা এখন একেবারেই অসম্ভব। এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যে নিম্নের যৎসামান্য উদাহরণই যথেষ্ট।

(ক) নাগরিক সুবিধা সংক্রান্ত চিত্রঃ

- বৈদ্যুতিক সংযোগ - বাংলাদেশে দ্রুততম সময়ে (এক সপ্তাহে) বৈদ্যুতিক সংযোগ পেতে হলে উন্নত শ্রেণীর জন্য ১০০০০০ - ১৫০০০০০ টাকা এবং নিম্ন শ্রেণীর সংযোগের জন্য ১০০০০ - ১৫০০০ টাকা প্রদান করতে হয়;
- গ্যাস সংযোগ পাওয়ার জন্যে সাধারণভাবে গড়ে তিন মাস অপেক্ষা করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে সরকারী ফিস মাত্র ৩০০০ টাকা, কিন্তু ৪০০০০ টাকা ব্যয় করলে সেই একই সংযোগ এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব;
- পানি - এ ক্ষেত্রে ওয়াসার কাছ থেকে পানির লাইন পেতে সাধারণত তিন থেকে চার মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু ১৪০০০ - ২০০০০ টাকা ব্যয় করেও সেই একই সংযোগ এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব;
- টেলিফোন - আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুন মেনে টেলিফোন সংযোগ পেতে হলে দরখাস্ত জমা দেয়ার পর দীর্ঘ ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে যতোজন টেলিফোন গ্রাহক আছেন তাদের মধ্যে এক শতাংশও গ্রাহক পাওয়া যাবেনা যারা কোন প্রকার অবৈধ লেনদেন বা তদ্বির ছাড়া যথাসময়ে টেলিফোন সংযোগ পেয়েছেন।

(খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দুর্নীতির চিত্রঃ বর্তমান বাংলাদেশে একটি সাধারণ মনোহারী দোকান চালু করার জন্য প্রায় ডজন খানেক লাইসেন্স, পারমিট ও অনুমতি লাভ করতে হয় যেগুলোর অধিকাংশই আবার বৎসরান্তে নবায়ন করা বাঞ্চনীয়। উদাহরণস্বরূপঃ

- ট্রেড লাইসেন্স - পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স এবং বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন পাওয়ার জন্যে বছরের পর বছর ধরে বিচিত্র আচার পালন ও চড়াই উৎরাই পার হতে হয়। এই লাঞ্চনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ব্যবসায়ীরা মাত্র ৫০০০ - ৮০০০ টাকা উপরি হিসেবে খরচ করে সব

কিছু এক সপ্তাহেই সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় লাইসেন্সটি লাভ করতে পারেন;

- কারখানা নির্মাণের লাইসেন্স - এ ক্ষেত্রে নির্মাণ লাইসেন্সটি পেতে মাত্র এক মাস সময় লাগার কথা থাকলেও নির্ধারিত ফিসের বাইরে উৎকোচ হিসেবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য ২০০০ - ৩০০০ টাকা, এবং প্রধান কারখানা পরিদর্শকের ছাড়পত্র লাভের জন্য ৫০০০ - ৮০০০ টাকা এবং সবশেষে শুধু কারখানা লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ৫০০০ টাকা প্রদান করা অলিখিত কিন্তু অপরিহার্য নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে।

উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন তৈরী পোষাক রপ্তানীকারককে ব্যবসা শুরু করার জন্য আইনগতভাবে প্রদেয় ব্যয়ের (৯১,৬৪০ টাকা) অতিরিক্ত ৩৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৩১০,৫২০ টাকা আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতির ব্যয় বাবদ ব্যয় করতে হয় (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)।

৪.৩ বাংলাদেশে দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই দুর্নীতির প্রচলন শুরু হলেও বিভিন্ন গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, দুর্নীতির স্বর্ণযুগ ছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের সময়। দুর্নীতি পূর্বে বা পরে আর কখনও এত উচ্চ মাত্রা লাভ করেনি। পুরো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে কোন দিকে নীতি ছিল না। সর্বত্রই দুর্নীতি। একটা বিশেষ গোষ্ঠী এরশাদ সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। শিল্পপতির চেয়ে মধ্যস্বত্বভোগী কোটিপতি বৃদ্ধি পেয়েছে এই সময়।

বাংলাদেশে জাতীয় কোন নির্বাচন এলে প্রতিদ্বন্দ্বী সব রাজনৈতিক দলই ক্ষমতার মসনদ লাভ করলে দেশ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি সমূলে দূর করার মাধ্যমে দেশে সুখ ও শান্তির নহর বইয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাকে; এবং কোন রকমে একবার সেই সোনার মসনদে আরোহণ করতে পারলে তারা আগেকার সকল প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজেরাই দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকার তাদের দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমন কমিশন,স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন, ন্যায়পাল নিয়োগ, বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি করার অংগীকার করেছে, কিন্তু সরকার গঠনের পর প্রায় তিনটি বছর অতিবাহিত হলেও সেসব অংগীকারের দুই একটি বিষয় নিয়ে কালে ভদ্রে কিছু বৈঠক, সভা আর কমিটি গঠন করা ছাড়া কার্যকর তেমন কিছু করতে পারেনি। বরং ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যেই পূর্ববর্তী সরকারের (১৯৯৬-২০০১) বিভিন্ন দুর্নীতির প্রমাণ হিসেবে তিন খন্ডে সমাপ্ত শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, শ্বেতপত্র প্রকাশ করেই যেন নির্বাচনী ওয়াদা অনেকখানি পূরণ করে ফেলেছে বর্তমান জোট সরকার। একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ করা আর সেই দুর্নীতির সুষ্ঠু বিচার করা এক কথা নয়। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এসব শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে যতোটা না বিচারের উদ্দেশ্যে তার চেয়ে বেশী তা করা হয়েছে প্রতিপক্ষ রাজনীতিকদের হয়রানির মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য।

বাংলাদেশে বিগত আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক গৃহীত দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত পদক্ষেপ গুলোও উপরোক্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে ছিলনা।ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তাদের Global Corruption Report 2001 এ দেখিয়েছে যে ১৯৯৯ সনে তৎকালীন বিরোধীদলীয় সাংসদ ও নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও হত্যা সংক্রান্ত ৭০টি মামলা বিচারাধীন ছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ***প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি লাভের পর দুর্নীতি সংক্রান্ড় মামলার তদন্ড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত 'দুর্নীতি দমন***

বুরো' নিজেই রাজনৈতিক ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ড় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের প্রধান শরীক দল বিএনপিও তাদের পূর্বের শাসনামলে (১৯৯১-১৯৯৬) একই ধরনের চর্চা করেছিল। প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটিই এহেন নীতি বিবর্জিত রাজনীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দুর্নীতির দায়ে বিএনপি কর্তৃক ১৯৯০ সালে সাজাপ্রাপ্ত এরশাদ ১৯৯৭ সালে আওয়ামীলীগের 'ঐক্যমত্যের সরকার' এ যোগ দেয়ার মুচলেকা দিয়ে ফের জেল থেকে মুক্তি লাভ করে। সেই একই এরশাদ আওয়ামীলীগের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে ২০০০ সালের আগস্ট মাসে তৎকালীন বিরোধীদল বিএনপির সাথে জোট বাঁধলে তার বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগ পুনরায় দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাকে কারাগারে প্রেরণ করে। ২০০০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি'র নের্তৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করলে ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে জেল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং চারদলীয় ঐক্যজোট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বর্তমানে দুর্নীতি বাংলাদেশে কতোটা ব্যাপ্তি লাভ করেছে তা অনুধাবনের জন্য সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের কয়েকটির উল্লেখ করাই যথেষ্টঃ

১. বই কেনা বেচার রাজনীতি - বর্তমান সরকার সারা দেশে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সর্বমোট ২৪ কোটি টাকার বই কেনার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বই কেনার জন্যে কোটি টাকা খরচ করা অবশ্যই একটি মহৎ উদ্যোগ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো উক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক স্কুলের ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় হাঁস মুরগী পালন, চিংড়ি চাষ, প্রেম ও যৌনতা সংক্রান্ত অনেক বই রয়েছে; আর কলেজ শিক্ষকদের জন্য কেনা হচ্ছে শিশুতোষ বই।

২. অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ফেরী মেরামত সংক্রান্ত ঘটনা, গম ক্রয় সংক্রান্ত ঘটনা এবং দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ঘটে যাওয়া ঘটনা ইত্যাদি সবগুলোই নির্লজ্জ দুর্নীতির নগ্ন বহি:প্রকাশ।

৫. দুর্নীতি রোধের উপায়

বাংলাদেশে দুর্নীতি রোধে দুর্নীতি দমন ব্যুরো চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে; এই ব্যর্থতা ব্যুরোর অভ্যন্তরীণ কোন কারণে সৃষ্টি হয় নি। বরং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সংস্থাটি কখনই সরকারের রাহুমুক্ত থেকে তার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায় নি। আমাদের দেশে কোন আমলা বা রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলেই সেটাকে রাজনৈতিক রং প্রলেপের চেষ্টা তদ্বির চলে। ব্যক্তিগত অপরাধকে রাজনৈতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট করার যে সংস্কৃতি বিগত বছরগুলোতে এদেশে চর্চা করা হয়েছে সেই সংস্কৃতিই দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্তাব্যক্তিদেরকে দুর্নীতিবাজ হবার দুঃসাহস যুগিয়েছে। যাহোক, বাংলাদেশের দুর্নীতি চর্চার প্রসার রোধ করার জন্য অনেকেই বিদ্যমান আইনি পরিবেশ সংস্কারের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। তাদের ভাষায় আমাদের দেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায়, প্রজাতন্ত্রের বর্তমান সংবিধানের বিধি বিধান সমূহ যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা গেলেই এদেশ থেকে দুর্নীতি নামক মহামারী চিরতরে দূর করা সম্ভব।

আইনের প্রয়োগিক পরিবেশগত যে সব সমস্যা আমাদের দেশে প্রাচুর্যের সাথে বিদ্যমান, সেগুলো দূর

করা একান্ত আবশ্যক। দুর্নীতি সমস্যার টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সর্বাগ্রে আমাদের আইনের প্রয়োগিক পরিবেশগত সংস্কার সাধন করতে হবে। আইনের প্রয়োগিক পরিবেশ বলতে এখানে আইনের প্রয়োগকারী সংস্থাসমসূহ, দেশের বিচার ব্যবস্থা ও সার্বিকভাবে আইনের প্রতি গণমানুষের আস্থা ইত্যাদি সবকিছুকে বুঝানো হচ্ছে। প্রয়োগিক পরিবেশগত সংস্কার সাধন ব্যতিরেকে শুধু নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি রোধের চেষ্টা করা হলে তা নিতান্তই বাহুল্য ও অকার্যকর হিসেবে প্রতীয়মান হবে। আইন প্রণয়ন নয়, আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা গেলে খুব দ্রুতই দুর্নীতি নামক বিষবৃক্ষের মূল এদেশের মাটি থেকে চিরতরে উৎপাটন করা সম্ভব হবে। অপরাধের শাস্তি যদি অপরাধীকেই ভোগ করতে হয়, তবে অবশ্যই অপরাধ প্রবণতা বন্ধ হতে বাধ্য। যাহোক, দুর্নীতির টেকসই সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নে উল্লিখিত ১৪-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমাদের দেশে বিরাজমান সমস্যা সমূহের সুষ্ঠু সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের ক্রমাগত ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে জাতীয় ভাবে পরমুখাপেক্ষী নীতি অবলম্বন। আমাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা ভিন্নদেশী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বাৎলে দেয়া পন্থা অবলম্বন করি। বাহ্যিক কোন পক্ষের প্রস্তাবিত কলাকৌশল অবলম্বনের ফলে দ্বি-মুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়ঃ প্রথমত, অদেশীয় ব্যক্তি/গোষ্ঠী আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর সাথে সম্যক ভাবে পরিচিত থাকে না বিধায় তাদের প্রস্তাবিত কর্মসূচীগুলো শত ভাগ ফলপ্রসূ হয় না। দ্বিতীয়ত, পরমুখাপেক্ষী মনোভাব আমাদের নিজস্ব সৃজনশীল দেশ গুলোতে বিরাজিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কতিপয় গড়পড়তা কৌশল প্রণয়ন করে থাকে। কিন্তু তাদের প্রণীত কলাকৌশল সমূহ সিংহ ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যথতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, কোন একটি বিশেষ সমস্যা একাধিক দেশে বিরাজ করলেও দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে সমস্যাটির উপস্থিতি একেক দেশে একেক রকম হয়ে থাকে। আর তাই বাংলাদেশের নিজস্ব তথা অভ্যন্তরীণ কোন সমস্যার কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করার জন্য বাহ্যিক কোন পক্ষের প্রস্তাবিত কলাকৌশলের বদলে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের তৈরী পদক্ষেপ অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়।

প্রথমত ঃ বিদেশী দাতা গোষ্ঠী বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমান সরকার স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে যাচ্ছে। কিন্তু, প্রস্তাবিত কমিশনটি যে পরিবেশে তার দায়িত্ব পালন করবে, সেই পরিবেশের কাঠামোগত সংস্কার না করা হলে এহেন কমিশন গঠনের ফলে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদের প্রভূত অপচয় করা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনের যে কোন প্রয়াস কেন সফল ও কার্যকর হবে না তা অন্যান্য বিষয়ে ইতিপূর্বে গঠিত কমিশনগুলোর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হবে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূ বেসরকারীকরণের কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ ক্রমে প্রাইভেটাইজেমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। এমন কি উক্ত কমিশনের প্রধান নির্বাহীকে প্রতিমন্ত্রীর সমমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তথাপি, গুটিকতক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করা ছাড়া রাষ্ট্রায়াত্ত লোকসানী প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে উক্ত কমিশন এখনো উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে পারে নি। পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘস্থায়ী লোকসান গাথা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত প্রাইভেটাইজেশন কমিশন নিজেই শত ভাগ লোকসান দিচ্ছে, সার্বিক বিচারে উক্ত কমিশনের মূল্য সংযোজন ঋণাত্বক।

তাই বাংলাদেশে দুর্নীতি লাঘবের জন্য প্রস্তাবিত কমিশনটি গঠন না করে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আধুনিকায়নের মাধ্যমে একে সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কাজ করার পরিবেশ প্রধান করতে হবে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি ব্যুরোর সাথে অন্যান্য সহযোগী পক্ষ যেমন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ইত্যাদির কার্যকর সহযোগিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান অনুসারে অনতিবিলম্বে ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ন্যায়পাল দপ্তরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষাভাবে তার ওপর ন্যস্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। উল্লেখ্য, কাজের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা না হলে আমাদের দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যথাঃ নির্বাচন কমিশন) এর মতো ন্যায় পালের ভূমিকা নিয়েও জনমনে সন্দেহ দেখা দিবে।

তৃতীয়ত ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে; এ উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতার যথেষ্ট বিকেন্দ্রীয়করণ করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদেরকে পরিষদের নীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ডে অধিক হারে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত প্রহণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অবিলম্বে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতি রোধের প্রক্রিয়ায় দেশের নারী সমাজ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম, কেননা মনস্তাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের দুর্নীতিবাজ হবার সম্ভাবনা অনেক কম।

চতুর্থত ঃ সরকার পরিচালনার কাজে অনতিবিলম্বে 'ই-গভর্নেন্স' বা বৈ-শাসন চালু করতে হবে। বৈ-শাসন ব্যবস্থা চালু করা হলে দুই ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে ঃ এক, এর ফলে সরকারের কাজকর্ম সম্পাদনের গতি ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পারেব, কাজের মান ও দক্ষতার প্রভুত উন্নতি সাধিত হবে। দুই, এর প্রভাবে সরকারী কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি বলবৎ হবে। বৈ-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রণীত কুখ্যাত অফিসিয়াল সিক্রেটস আইন বাতিল করতে হবে।

পঞ্চমত ঃ সংবিধানের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী অতি সত্বর প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করতে হবে। বর্তমান ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট তাদের বিগত নির্বাচনী ইশতেহারে বিচার বিভাগ পৃথকী করণের অঙ্গীকার করেছিলো। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রায় তিনটি বছর অতিক্রান্ত হলেও সরকার সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যূনতম কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সরকারী দলকে তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।

ষষ্ঠত ঃ পাপুয়া নিউ গিনিতে ব্যবহৃত 'রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সততা বিধান' (The Integrity of Political Parties and Candidates Act) – এর আদলে বাংলাদেশেও একটি নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইনের আওতায় রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে দেয়া তাদের সকল প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে। কোন রাজনৈতিক দল বা দলের কোন নেতা কোন পর্যায়ে নির্বাচিত হবার পর যদি নির্বাচনের আগে প্রদত্ত কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে, তবে এই আইন অনুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সপ্তমত ঃ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মনস্তাত্ত্বিক ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে Leadership Development Institute নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। ন্যায়পাল এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বক

সনদপত্র অর্জন করতে হবে। উক্ত সনদপত্র অর্জন ব্যতীত কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন লাভের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে অচিরেই রাজনৈতিক দল সমূহের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। বিশ্বের শিল্পোন্নত অনেক দেশেই রাজনীতিবিদদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি উক্ত প্রতিষ্ঠান সরকারী দপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ সেবা প্রদান করবে। পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত সংসদ সদস্যদেরকে সংসদে দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করাও এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হবে। এহেন প্রশিক্ষণ কর্মশালা নির্বাচিত সাংসদদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ফলশ্রুতিতে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে জাতীয় সংসদে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আচরণ করা থেকে সাংসদগণ বিরত থাকবেন।

অষ্টমত ঃ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহনের পর অন্ততঃ পাঁচ বচরের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। গত এক দশকে দেখা গেছে যে, সরকারী আমলা ও সামরিক কর্মকর্তাগণ কর্মজীবনেই প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির নেতা, সাংসদ, এমনকি মন্ত্রীও হয়েছেন। এই ব্যবস্থা সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি চর্চার স্পৃহাকে মারাত্মক ভাবে বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন আমলা তার পদবী বলে এক কোটি টাকা আত্মসাৎ করে শীর্ষস্থানীয় কোন রাজনৈতিক দলকে বিশ/ত্রিশ লাখ টাকা অনুদান দিয়ে বিচারের হাত থেকে সহজেই পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। বাংলাদেশে সরকারী আমলাদের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটি অতীতের সামরিক সরকারগুলোর কার্যকালে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে সরকারী আমলাদের মধ্যে যারা নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে চান, তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

নবমত ঃ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে কোন পর্যায়ে যে কোন পদে যোগদানের সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ও তার পরিবারের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির পরিপূর্ণ হিসাব সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে। যোগদানের পরে থেকে দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রতি তিন বছর অন্তর তাদের সম্পত্তির হিসাব নিরীক্ষা করবে। একই ভাবে সরকারী দলের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, ও সংসদ সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রতি বছর নিরীক্ষা করবে। এর ফলে সরকারী আমলা ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি প্রবণতা ব্যাপক ভাবে হ্রাস পাবে।

দশমত ঃ ন্যায়পাল দপ্তর সপ্তম অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত Leadership Development Institute এর মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী আমলাদের জন্য একটি আবাসিক Retreat ক্যাম্প পরিচালনা করবে। এই ক্যাম্পে অংশ গ্রহণের ফলে সরকারের দুর্নীতিবাজ আমলারা নিজেদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাবে।

এগারোতম ঃ মাধ্যমিক স্তরে, বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণীতে 'দেশ প্রেম ও সততা' শিরোনামে একটি নতুন বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হবে।

বারোতম ঃ দুর্নীতি রোধের প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ ও বেগবান করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজকে আরো বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারী আমলা ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির কোন তথ্য পাওয়া গেলে সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে

সুশীল সমাজের সংগঠন গুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য দেশের ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে।

তেরোতম ঃ সারাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যেমন, মসজিদের ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

চৌদ্দতম ঃ সর্বোপরি, দুর্নীতি সমস্যাটির টেকসই ও কার্যকর সমাধানের জন্য দেশের গণতন্ত্র চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ তথা পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত না হলে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন কখনো অর্জিত হবে না। অগণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা দুর্নীতি সহায়ক।

৬. *উপসংহার*

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, পুঁজির বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত অভাবিত উন্নয়ন, ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিযোগিতার এই যুগে দুর্নীতির দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ থেকে কোন দেশের পক্ষেই আরাধ্য উন্নয়নের শিখরে আরোহণ করা সম্ভব নয়। জাতি হিসেবে আমরা অনেক সময় ও সম্পদ ইতোমধ্যেই নষ্ট করে ফেলেছি। আমাদের অর্থনীতির অগ্রগতি নয়, বরং আরো অবনতি যেন না ঘটে সেই জন্যেই দুর্নীতির বিরূদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে সরকারকে, এবং সুশীল সমাজ সহ সর্বস্তরের মানুষকে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করানোর মাধ্যমে দুর্নীতির বিরূদ্ধে প্রস্তাবিত যুদ্ধকে জনমানুষের যুদ্ধের রূপ দিতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। Alberto Arene,``Derrotemos la Corruption en Centroamerica?, extracts from the central America Anti-Corruption Forum, 6-7 April 2000.

২। আবদুল্লাহ ফারুক, ''বাংলাদেশের অর্থনীতি'', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা।

৩। জান্নাতুল ফেরদৌস,''বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে দুর্নীতির স্বরূপ'', টান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০১।

৪। সেলিম জাহান, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি'', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১ ঢাকা।

৫। মইনুল ইসলাম, ''বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও দুর্নীতির অর্থনীতি'', আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৯৭।

৬। J.S. Nye,``Corruption and Political Development : A Cost Benefit Analysis'', American Political Science Review, LXI,2,1967.

৭। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০১।